রাগ

হীরেন চট্টোপাধ্যায়

কাঁচুমাচু মুখ করে সামনে এসে দাঁড়ায় নেপাল। অপরাধীর মত মুখ করে বলে, 'দাদা, আপনার ইয়েটার ব্যবস্থা কিন্তু এখনও...'

মাসের প্রথম দিকে এই এক নিয়মমাফিক ব্যাপার। সেই কবে হাজার পাঁচেক টাকা ধার নিয়েছিল। শোধ দিতেও পারবে না। জানা কথা , কোনোরকম মাধ্যমিক পাশ ছেলে, বাপ চট কলের লেবার, ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। আমি হাসিমুখে বলি, 'আমি কি তোমায় তাগাদা করেছি নেপাল! কেন যে এই এক কথা বলে আমায় লজ্জা দাও'—

নেপাল আরো গদগদ হয়ে বলে, 'সত্যি এই জন্যে আপনাকে এত ভক্তি— ছেদ্দা করি। মানুষের শরীর, কিন্তু রাগ বলতে কিছু নেই। টাকা ধার নিয়েছি আমি, লজ্জা আমারই পাওয়ার কথা, অথচ এমন করে আপনি বলেন, যেন'—

বলবো না কেন, যতই 'ভক্তি - ছেদ্দা' করুক নেপাল, আমার বিদ্যেও তো ওই মাধ্যমিক। বাবা বিরাট চাকরি করতো, মালকড়ি জমিয়েছে অনেক, পেনশনও ভালো পায়, আমি গলগন্ড পুত্র চুটিয়ে খরচ করে যাচ্ছি। বাবা কোনদিন গাড়ি চড়ে নি, মানে নিজের গাড়ি, আমি গাড়ি উড়িয়ে কাজে যাচ্ছি। কী কাজ না কন্ট্রাকটরি। কত ধানে কত চাল সে তো আমিই বুঝি। বাবার রেস্তো না থাকলে বেলুন চুপসে যেত এতদিনে!

সত্যি কথা বলতে কী, কাজ থাকুক না থাকুক সব সময়ই তো একটা ব্যস্তসমস্ত ভাব দেখাচ্ছি। সামলাচ্ছে তো সব নেপাল। বললেই বশংবদ ভাব, 'কী বলেন দাদা, বেকার মানুষ, এটুকু যদি না করতে পারবো—'

ক'দিন আসছিল না নেপাল, এল যেদিন, চমকে গেছি আমি, বললাম, 'কী হয়েছে তোমার নেপাল?'

'বাবা চলে গেল, দাদা।'

'মানে? কী হয়েছিল?'

'একেবারে সুস্থ সবল মানুষ - কাজ করছিল, ওপর থেকে বিরাট একটা লোহার রেল স্লিপ করে - একেবারে সঙ্গে সঙ্গে ফিনিশ্। মানুষ চেনা যায় না-'

'ইস! এ ভাবে অ্যাকসিডেন্টে তোমার বাবা—'

'কোম্পানি অবশ্যি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল - বড় সাহেব, খুব দুঃখ দুঃখ করলে - বললে অ্যাকসিডেন্টের ওপর তো মানুষের হাত নেই - তারপর একটা চেক আমাকে ধরিয়ে দিলে।'-

'চেক! টাকা?' আমার কান গরম হতে শুরু করেছিল, কেন আমি বুঝতে পারছিলাম না বললাম, 'কত টাকা?'

'পঞ্চাশ হাজার টাকা। শুধু তাই না দাদা, কোম্পানি বাবার চাকরিটাও আমাকে দিয়েছে। প্রথম বছর ছয় হাজার করে আমাকে দেবে, তারপর কাজটাজ শিখে গেলে—'

নেপালের পরের কথাগুলো আমার কানে যাচ্ছিল না, কী যে হচ্ছিল বুঝতে পারছিলাম না, সম্বিৎ যখন ফিরল, নেপাল হাত ধরে ঝাঁকাচ্ছে আমায়, বলছে- 'দাদা, কী হল আপনার? আপনি কি অন্য কিছু ভাবছেন? ভাববেন না। বাপটা গেছে বটে ঠিক, নেপাল এখন আপনাদের আশীর্বাদে—'

'জানি জানি, শুনলাম তো সাতকাহন! প্রচণ্ড রাগে কান টান ঝাঁ ঝাঁ করছিল আমার, কোন রকমে নিজেকে সামলাতে সামলাতে বললাম, 'বলি অন্য সব কাজকর্মও তো আছে আমার। সকাল থেকে ভ্যাজর ভ্যাজর - যাও বেরিয়ে যাও। এ মুখো হবে না তুমি, যাও।'

ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়েছিল নেপাল, সেদিকে দৃক্‌পাত না করে বেরিয়ে গেলাম আমি।

ফুটব্রিজের প্রয়োজনীয়তা

সৈকত মুখোপাধ্যায়

ছেলেটা প্রায়ই বিকেলের দিকে ফুটব্রিজের ওপরে গিয়ে দাঁড়ায়। ছেলে তো নয়, যুবক। কিন্তু এতই সে রোগা যে বয়স বোঝা যায়না।

রোগা আর সরু।

বেকার বলে চোখের দৃষ্টিতেও কিশোরের মতন ভীতু ভীতু ভাব। উড়োঝুড়ো গোঁফদাড়িগুলোও রেশম রেশম, - অপুষ্টিতেই হবে বোধহয়।

বেশ লাগছে ছেলেটার, -ওই ফুটব্রিজের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে, নিচে খাল দিয়ে বয়ে যাওয়া কালো জলের দিকে চেয়ে থাকতে। তীর বরাবর বাবলা গাছের সারি। শহরে উপচানো উপভোক্তাদের উল্লাস কিছুটা ওই সবুজ পাতার বেড়া ওদিক থেকে যায়। অদূরে মস্ত বড় রাজপথ ধরে ছুটে চলা গাড়িগুলো যে ধোঁয়া ছেড়ে যায়, তার গন্ধও এখানে অত তীব্র লাগে না; বরং মাঝে মাঝে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেলে কদম ফুলের মৃদু সৌরভ ভেসে আসে। তাছাড়া খালের অত্বর জলধারায় কত কচুরিপানা ফুল ফোটে; প্রাইমাস স্টোভের শিখার মতন নীল রঙ। কি সুন্দর!

তবু মাছ নয়, জল নয়, ফুল নয়, বৃষ্টিও নয়। ফুটব্রিজটাই সবথেকে ভালো লাগে ছেলেটার। কেমন রোগা আর সরু! খুব যে একটা কাজে লাগে তাও নয়। বেকারই বলা চলে। পায়ে হেঁটে আর কজনই বা পথ চলে আজকাল? নিজের গাড়ি, না হলে বাস ট্রাম, ট্যাক্সি, অটো, -এসবেই তো যাতায়াত। আর তাদের উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আছে বড় বড় ক্যান্টিলিভার ব্রিজ।

প্রথম সেতু, দ্বিতীয় সেতু, তৃতীয় সেতু, আর আছড়ে পড়া চাবুকের ঢঙে প্যাঁচ খাওয়ানো সব ফ্লাইওবার। সে সব কথাতে কার দায় পড়েছে ট্যাঙশ ট্যাঙশ করে এতটা হাঁটার? সিঁড়ি ভেঙে এদিকে ওঠার, ওদিকে নামার? তার ওপরে, একটু স্বাস্থ্যবান হলে এই সবুর ব্রিজে পাশাপাশি দুজনে হাঁটাও যায় না। এই সব কারণেই সুখী লোকেরা পারতপক্ষে ফুটব্রিজটাকে এড়িয়েই চলে। তারা বড় গাড়ি চেপে আড়াই মাইল উজিয়ে বড় সেতু পেরিয়ে ওপারে চলে যায়।

তবুও বিজ্ঞাপনদাতাদের নজর এড়িয়ে ফুটব্রিজটা তার নিরঞ্জন অস্তিত্ব নিয়ে টিকে আছে, - বাবলা গাছের ছেঁড়াখোড়া আঁচলে বাঁধার গরীব ঘরের বউয়ের শীর্ণ চাবিকাঠিটার মতন। আছে বলেই ফেরিওলারা - যারা মোট নিয়ে বাসে ট্রামে উঠতে পারে না - তারা পায়ে পায়ে খাল পেরিয়ে এপাড় থেকে ওপাড়ে ফেরি করতে যেতে পারে। সে তেমন কিছু বাণিজ্যসম্ভার নয়। হয়তো তালপাতার পাখার একটা লঘুভার বোঝা। কিম্বা বাঁকের এদিকে পাঁচ, ওদিকে পাঁচ খাঁচাভর্তি ময়না টিয়া। কিম্বা ধনেখালি শাড়ির একটা বাইরে মলিন ভেতরে রঙিন গাঁঠরি। সত্যি, অবাক হয়ে ছেলেটা ভাবে আমার শৈশব থেকে কেমন করে এই সব হারিয়ে যাওয়া ফেরিওলারা এখানে ফিরে আসে! স্বপ্নসাঁকো না কি এটা? আর শুধু কি তাই? একদিন ছেলেটার পাশ কাটিয়ে কতগুলো ফাইভ সিক্সের স্কুল পালানো বাচ্চা ফুটব্রিজ ধরে দৌড়ালো না? তাদের চুলে জবজবে তেল, পায়ে হাওয়াই চটি, আর হাতে ছোটো ছোটো টিনের স্কুলবাস্ক, যেমনটি এখন আর চোরাবাজারেও কিনতে পাওয়া যাবে না। আর সব থেকে আশ্চর্যের কথা, সবকটার নোঙরা সাদা জামার পিঠে পিছন থেকে ছিটিয়ে দেওয়া কালির ফোঁটার মালা। আর এই, এই তোরা ফাউন্টেন পেন কোথায় পেলি রে?-

বলতে না বলতেই সব ওদিকের সিঁড়ি দিয়ে নেমে হাওয়া। স্বপ্নসাঁকো না তো কী?

শেষ কথা যেটা বলবার সেটা হল এই, - ওই ফুটব্রিজটায় ছেলেটা আসার কিছুক্ষণ পরে একটা মেয়েও আসে। রোগা, ভীতু হাবলা মতন। নাচ জানে না, ইংরিজিতে কথা কইতে পারে না অবধি। তা না পারুক। ফুটব্রিজটার এদিক থেকে ওদিক তারা দিব্যি পাশাপাশি হাঁটতে পারে। হাঁটেও যতক্ষণ না খালের কালো জলে তারা ফুটছে। রোগা বলেই পারে। বলেছি না ব্রিজটা ভীষণ সরু।

শুধু বলি, যারা স্বাস্থ্যবান, আত্মবিশ্বাসী, যারা খুব চওড়া জায়গা ছাড়া হাঁটতে পারেন না, এই মুহূর্তে যারা টোল - প্লাজা থেকে গাড়ি তুললেন দ্বিতীয় সেতু, তৃতীয় সেতু, কিম্বা আগামীর কোনো অবধারিত সেতুর ওপর, তারা দয়া করে এই ফুটব্রিজটার দিকে নজর দেবেন না। রোগা, ভীতু, স্বপ্নতাড়িত মানুষদের ফুটব্রিজ খুব কাজে লাগে।

বন্দুকের নল

পরিতোষ রায়

কয়েকদিন ধরে বাতাস অন্যরকম। শাল - পিয়াল - মহুয়ার জঙ্গলে কানাকানি, ফিসফিসানি। দুম করে নাকের ভেতর আঘাত করে ঝাঁঝালো গন্ধ। জঙ্গলের মানুষজন কখনও ওই গন্ধ আগে পায়নি। হয়তো জানোয়াররাও কোনদিন অনুভব করেনি। নইলে তারাও বা কেন চলতে চলতে মাঝে মধ্যে থম্‌কে দাঁড়ায়! সন্দিগ্ধ চোখে চতুর্দিকে তাকায়।

তারা আসে। মাঝে মধ্যেই আসে। যারা খেতে পায় না, তাদের খেতে দেয়। মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে। দুঃখের কথা শোনে। যাওয়ার সময় বলে যায়, একদিন সু-সময় ফিরবে। সব্বাই খেতে পারবে!

তারা অবশ্য এখনও আসে। তবে খুব কম। কী রকম যেন তাদের চাউনি। আগের মতো মন খোলা কথা নেই। কেমন যেন 'ভয় ভয়' ভাব ছড়ানো - ছড়ানো তাদের চলনে বলনে।

পার্বতী হেমব্রম সব দেখেন। কিছু বোঝেন, কিছু বোঝেন না। ছেলেটার সঙ্গে তাদের ফিস্‌ফিস্ কথা হয়। কিছু কথা কানে আসে। কিছু আসে না। একদিন ছেলেটা চলে গেল। শুধু যাওয়ার আগে বলে গেল, সে ভাত আনতে যাচ্ছে।

পার্বতী প্রতিদিনতো ভাত খেতে চায় না। স্বপ্ন দেখে সপ্তাহে দু'দিন ভাত খাওয়ার। বাকি দিনগুলি কন্দমূল - পিঁপড়ের ডিম - কচু যা হোক কিছু একটা খেয়ে পেট ভরাতে পারবে। ছেলেটা ভাত আনতে গেল। এবার থেকে নাকি রোজ ভাত খাওয়া যাবে! এ যে পোড়া পেটের অশান্তির দহন!

সন্ধ্যের দিকে শাল - পিয়ালের ফিস্‌ফিসানি বন্ধ হয়ে গেল। গত দু'দিন ধরে পার্বতী জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ছেলে আসবে!

পরিবর্তে শাল - মহুয়ার ডালে ডালে, জানোয়ারদের ক্ষিপ্র চলাফেরায় বাতাসে ঘুরপাক খেতে লাগল গুটিকয় শব্দ- বন্দুকের নলেই নাকি শান্তি ফেরে!